সামাজিক পরিবর্তন (Social Change)

পরিবর্তনশীলতা প্রকৃতির নিয়ম। মানব সমাজও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। মানব সমাজ কখনও স্থাণু হয়ে থাকে নি, নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তন প্রবাহই হচ্ছে সমাজ। ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সমাজের আকার অবিরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে - কখনও তার কলেবর বৃদ্ধির জন্য, আবার কখনও তার ক্ষীয়মাণতার জন্য আমাদের সমাজ নতুন নতুন আকার ধারণ করে চলেছে। পরিবর্তনশীল বলেই মানবসমাজ আদিম বর্বর অবস্থা অতিক্রম করে আধুনিককালের সভ্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজ বলতে বোঝায় এক নিবিড় ও জটিল সম্পর্ক জালকে। এই সম্পর্ক জালের সৃষ্টি হয় মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা আন্তঃর্ব্যক্তিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে। মানুষের আন্তঃমানবিক এই এই মিথস্ক্রিয়া গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। স্বভাবতই সমাজও গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, সমাজ হল জীবন প্রবাহের একটি কালক্রম। এই সমাজের ধারণা স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। সমাজ হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, এ কোন ফলশ্রুতি নয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক ভিজে (L. Von Wiese)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'Society is a process, not a product'। একশ বা হাজার বছর আগে যে সমাজব্যবস্থা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এখনকার সমাজব্যবস্থা অভিন্ন নয়, পরিবর্তিত প্রকৃতির। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বহিরঙ্গ তথা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয় ও হয়েছে।

তবে সমাজের পরিবর্তন সকল সময় সমান গতিতে ঘটে না। যদিও কোন সমাজ কখনও স্থবির ছিল না। পরিবর্তনের গতি কখনও মন্থর আবার কখনও দ্রুততর হয়েছে। কোন সমাজ কখনও কোন ক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর লাভ করে; সে সমাজ আবার কখনও অধোগামী হয়। সমাজে কখনও নতুনের আবির্ভাব ঘটে, আবার কখনও পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সমাজতত্ত্ববিদ্ হার্বার্ট স্পেনসার এই প্রসঙ্গে বলেন, একটি সহজ ও সাধারণ সংগঠন থেকে সমাজ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে একটি জটিল কাঠামোতে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ব্যাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে এবং বাস্তবে ঘটেও থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক পরিবর্তন বলতে অনেক সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক ব্যবস্থার সকল পরিবর্তনকেই বুঝে থাকেন। এই শ্রেণীর চিন্তবিদ্‌গণ সকল প্রকার রূপান্তকেই পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে এই রূপান্তর সাময়িক বা স্থায়ী হতে পারে, আবার আমূল বা বাহ্যিক হতে পারে। আবার অনেক সমাজবিদের মতে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক ব্যবস্থার স্থায়ী ও অপরিহার্য অংশের পরিবর্তনকে বোঝেন। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী আবার সামাজিক পরিবর্তনকে দুভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করার পক্ষপাতী।

এই দুটি ভাগের প্রথমটি হল গৌণ ও মৌলিক বা কাঠামোগত পরিবর্তন এবং অপরটি হল সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানী রস (Ross) এবং লী (Mec Clung Lee) র মতানুসারে সামাজিক কাঠামোর বা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (social institution) পরিবর্তনই হল সামাজিক পরিবর্তন। এঁরা সমাজজীবন বা সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বা মৌলিক পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করেন না। অনেকে আবার সামাজিক পরিবর্তনকে সামগ্রিক ও আংশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করার পক্ষপাতী। আবার অনেক সমাজবিদের অভিমত, সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের ধারণা অবাস্তব। এঁদের মতে সামাজিক পরিবর্তন হল সকল সময়েই আংশিক।

ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ্ মরিস জিনস্বার্গ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে যে সকল পরিবর্তন সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটায় সেগুলিই সামাজিক পরিবর্তন বলে পরিগণিত হয়। তিনি বলেন, সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমি বুঝি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন; অর্থাৎ সমাজের পরিধি, তার বিভিন্ন অংশের গঠন বা ভারসাম্য বা তার গঠন বিন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তন। ..... দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাসের পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার অর্ন্তভূক্ত। সুতরাং অধ্যাপক জিনস্বার্গ সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ বা ব্যক্তির বিশ্বাস, আদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তনকেও অর্ন্তভূক্ত করেছেন। তার কারণ হল সমাজ-কাঠামো এবং সমাজবদ্ধ মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে থাকে।

অধ্যাপক কিংস্‌লে ডেভিস (Kingsley Devis) সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজের গঠন ও কর্মধারার পরিবর্তন অর্থাৎ সমাজের কাঠামো ও কার্যাবলীর পরিবর্তন। আবার অনেক সমাজবিদের মতে সমাজস্বীকৃত জীবনধারার পরিবর্তনই হল সামাজিক পরিবর্তন। অধ্যাপক টম বটোমোরের মতে, এ পর্যন্ত প্রণীত সামাজিক পরিবর্তন জনিত প্রধান মতবাদসমূহ ইতিহাসের দর্শন বা দার্শনিক নৃবিদ্যার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এ প্রসঙ্গ তাঁর আরও অভিমত হল বিবর্তন, উন্নয়ন, প্রগতি, প্রচলিত মতামতের পরিবেশে পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের মতবাদসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বর্তমান। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানবসামাজের যাবতীয় ইতিহাসগত পরিবর্তনকে সাধারণভাবে বলা হয় সামাজিক পরিবর্তন। আবার সমাজবিদ্ কোঁৎ (Comte) এর মতবাদে সামাজিক পরিবর্তনকে বৌদ্ধিক পরিবর্তনের ফল হিসাবে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধিক অগ্রগতির পরিপূরক হিসাবে নৈতিক উন্নতি, অহংবাদের বদলে পরার্থবাদের প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের কথা বলা হয়।

হেগেলের মতে, পরমতত্ত্ব পরমচিন্তা (Absolute Thought) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে (Dialectical Method) সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করে চলেছেন। কার্ল মার্কস্ আবার হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেও সমাজ পরিবর্তনের ভাববাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে জড়বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্কসের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত শ্রেণী দ্বন্দ্বই সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। মূলত দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কার্ল মার্কস্ সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাব। বর্তমান সমজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তমান এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমরা নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করলাম।

১) সামাজিক পরিবর্তন বৈচিত্র্যময় ঃ বৈচিত্র্য হল সামাজিক পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন কখনও পরিকল্পিত ও একমুখী, আবার কখনও অপরিকল্পিত ও বহুমুখী। এই পরিবর্তন কখনও ক্ষণস্থায়ী, কখনও আবার উন্নতিসূচক ও জনকল্যাণমূলক, আবার কখনও অবনতিসূচক ও ক্ষতিকর।

২) সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিসম্পন্ন ঃ এই পরিবর্তন ক্ষেত্রবিশেষে এত দ্রুত সম্পাদিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আকস্মিক প্রতিপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে সামাজিক বিপ্লব বা বিশ্ব যুদ্ধের কথা বলতেই পারি। এই সকল ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অভাবনীয়ভাবে সামাজিক পরিবর্তন সম্পন্ন হয়। তবে স্লথ গতিরও সামাজিক পরিবর্তন সমাজে লক্ষ্য করা যায়। এতটাই স্লথ গতির পরিবর্তন যে তা কারুর চোখেই পড়ে না। আসলে সকল সমাজেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পরিবর্তনের গতি হয়ত সকল সমাজে একই রকম হয় না।

৩) অনিশ্চয়তাপূর্ণ ঃ সামাজিক পরিবর্তন অনিশ্চয়তাপূর্ণ। এর কারণ হিসাবে বলা হয় সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে নানা বিচিত্র কারণ কাজ করে। আবার সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি অস্থায়ী ও জটিল প্রকৃতির। এই সকল কারণের জন্য সামাজিক পরিবর্তন অনিশ্চয়তাপূর্ণ। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আগাম কিছু অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কারণ সামাজিক পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কোন নয়ম বা ধারা নেই।

৪) কারণসমূহের পরম্পরা ঃ যে কোন সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন কারণ সমূহের সমবেশ লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তা ছাড়া তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু তাহলেও এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয় না।

৫) নিরবচ্ছিন্নতা ঃ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ সমূহের পরম্পরা থাকে বলে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন ঘটলেও যে-কোন সমাজের স্বতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অক্ষুন্ন থাকে। প্রত্যেক সমাজের একটা নিজস্ব ধারা থাকে। এই ধারা সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যহত হয় না।

৬) সামাজিক পরিবর্তন প্রধানত সংস্কার ও পরিপূরক হিসাবেও প্রতিপন্ন হয়। বস্তুগত দ্রব্য সামগ্রী বা সামাজিক সম্পর্কসমূহের সংস্কার বা পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন মানুষের জীবন ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খাদ্যাভ্যাস। এই খ্যাদ্যাভ্যাস বা খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্তন ঘটে। তেমনি আবার সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন আগেকার দিনের যৌথ পরিবারের পরিবর্তে এখনকার অনুকোষ পরিবার ব্যবস্থা।

৭) সামাজিক পরিবর্তন হল সামাজিক, ব্যক্তিগত নয়। যে পরিবর্তনএর প্রভাব জনজীবনের ওপর পড়ে, কেবল সেই পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে পরিগণিত হয়। কোন বা কতিপয় ব্যক্তির জীবন ধারায় পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হবে না

৮) সামাজিক পরিবর্তন স্বাভাবিক। কারণ পরিবর্তন হল প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতিগতভাবে আমরা পরিবর্তনের পিয়াসি। আমাদের প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই সামাজিক পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে, আবার সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুপরিকল্পিত উদ্দ্যোগের ফলেও ঘটতে পারে।

৯) সামাজি পরিবর্তন হল একটি সর্বজনীন বিষয়। সকল সমাজেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তবে সমাজভেদে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও মাত্রার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কোন সমাজে দ্রুত গতিতে আবার কোন সমাজে মন্থর গতিতে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে।

১০) বিভিন্ন যুগে সামাজিক পরিবর্তনের গতি বিভিন্ন রকমের হয়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি, গতি ও মাত্রা কাল বা যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ যুগ বা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক উপাদানসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সমাজের দ্রুত পরিবর্তন যা স্বাধীনতার পূর্বে ছিল না।

সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক প্রগতি বা অগ্রগতি ঃ

সামাজিক প্রগতির ধারণা সমাজ দর্শনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। সামজতত্ত্ববিদ্ ও সমাজব্যবস্থার অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তি বর্গের কাছে সামাজিক প্রগতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য যাবতীয় বিরোধ ও বিতর্কের উর্দ্ধে। কিন্তু সঠিক অর্থে সামাজিক প্রগতি বলতে ঠিক কি বোঝায় তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা সহজ নয়। সামাজিক পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রদান করা গেলেও সামাজিক প্রগতির কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ নেই, পাওয়া যায় না। আসলে 'সামাজিক প্রগতি' কথাটি অস্পষ্টার্থক। অর্থের অস্পষ্টতার জন্য অনেকে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য (ক) সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক প্রগতিকে ভিন্ন ভিন্ন-রূপে গণ্য করেন এবং পরিবর্তন অতিরিক্তভাবে সামাজিক প্রগতিকে স্বীকার করেন। অনেকে আবার (খ) তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক প্রগতিকে অভিন্নরূপে গণ্য করে পরিবর্তন অতিরিক্তভাবে 'প্রগতি'কে অস্বীকার করেন।

ক) অধ্যাপক কোঁৎ (Auguste Comte), গিডিংস্ (F.H. Giddings), হবহাউস (L.T. Hob-house) প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সামাজিক প্রগতিকে সামাজিক পরিবর্তন থেকে ভিন্নরূপে গণ্য করেন। এঁদের মতে সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক প্রগতিও সম্ভব হয়। এঁরা সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক প্রগতির নিম্নে উল্লিখিত পার্থক্যগুলি করে থাকেন।

১) সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে না, সমাজের অর্ন্তনিহিত তাড়নাতেই সমাজ পরিবর্তিত হয়। অপরপক্ষে, সামাজিক প্রগতি লক্ষ্যসাধক, উদ্দেশ্যসাধক। কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ করতে পারলে তবে সমাজ উন্নত হয়, অগ্রসর হয়। কাজেই প্রগতির সাথে উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রশ্নটি জড়িত। সমাজের যে-কোন পরিবর্তন উৎকর্ষ-জ্ঞাপক হয় না। সামাজিক পরিবর্তন একমুখী নয়, বহুমুখী এবং ঐসকল বহুমুখী পরিবর্তনের কোন একটি দিক উন্নত হলেও(প্রগতি ঘটলেও) সকল দিক একই তালে এবং একই কালে উন্নত হয় না। কাজেই মানতে হয়, সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক প্রগতি দুটি ভিন্ন বিষয়। সামাজিক পরিবর্তনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজ উন্নত হয়, সামাজিক প্রগতি ঘটে।

২) সামাজিক পরিবর্তন মাত্রই সামাজিক প্রগতির পরিচায়ক নয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সমাজ পরিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে দাস-প্রথার প্রচলন হয়, যাকে কোনভাবে সামাজিক প্রগতিরূপে গ্রহণ করা চলে না। তেমনি ভারতীয় সমাজ পরিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে মানুষের স্বাভাবিক সামর্থ্য অনুসারে বর্ণ-বিভাগ, জাতিভেদ-প্রথায় পরিণত হয় এবং এই কলঙ্কিত পরিণতিকে কোনভাবেই সামাজিক প্রগতিরূপে গণ্য করা যায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতির উল্লেখ করেও সামাজিক প্রগতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

৩) প্রগতির সাথে এক মূল্যবোধ, বিশেষ করে নৈতিক মূল্যবোধ, যুক্ত থাকে। সামাজিক কোন পরিবর্তনের ফলে যদি ব্যক্তি তার আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করে, সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে অধিকভাবে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবেই সেই পরিবর্তনকে প্রগতি বলা যেতে পারে। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন মাত্রেই এপ্রকার মূল্যবোধ জড়িত থাকে না।

খ) দ্বিতীয় মতের সমর্থকগণ, বিশেষ করে ম্যাকাইভার ও পেজ উপরে উক্ত মতকে অগ্রাহ্য করে বলেন যে, সামাজিক পরিবর্তন এ সামাজিক প্রগতির মধ্যে সুস্পষ্ট কোন প্রভেব নেই। প্রগতির সুস্পষ্ট কোন লক্ষণ উল্লেখ করতে না পারার জন্য ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, সামাজিক পরিবর্তন যা, সামাজিক প্রগতিও তাই। কারণ, তারা উভয়ে এক ও অভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করে। ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত তাঁরই প্রদত্ত যুক্তিসহ নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

১) সমাজ যে পরিবর্তিত হয়েচে তা তার বিজ্ঞানসম্মত লক্ষণের উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠা করা গেলেও সামাজিক প্রগতির সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণের উল্লেখ করে সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে সামাজিক প্রগতি হয়েছে। 'আমরা সামাজিক প্রগতি প্রসঙ্গে বিশ্বাস পোষণ করতে পারি, কিন্তু অপরের কাছে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, যদি প্রগতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়নকে তারা স্বীকার না করে। একই সামাজিক পরিবর্তনকে মূল্যায়নের ভিন্নতার জন্য, অনেকে 'উন্নয়ন' বলে, আবার অনেকে 'অবনয়ন' বলেন। পরিবর্তিত বর্তমান সমাজব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক আদিম বর্বর মানুষের সমাজব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত বলেন, আবার অনেকে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত বলেন। স্পষ্টতই সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে মনুষের ঐক্যমত্য থাকলেও সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে সেরকম কোন মতৈক্য লক্ষ্য করা যায় না।

২) ‘প্রগতি’র ধারণাটি বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ তা চিরস্থায়ী কোন ধারণা বা প্রত্যয় নয়। প্রগতির ধারণাটি দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, পাশ্চাত্যের অষ্টাদশ শতাব্দীর ‘নবজাগরণে আলোকপ্রাপ্ত’ ব্যাক্তিগণ ‘প্রগতি’ বলতে ‘ঐতিহ্যের বিরোধিতা ও চিন্তার স্বাধীনতা’কে বুঝেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার অধিবাসীরা ‘প্রগতি’র অর্থ করেছেন ‘প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তার’। স্পষ্টতই প্রগতির ধারণাটি বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের মতো কোন স্থায়ী প্রত্যয় নয়, তা দেশ-কাল ভেদে এক পরিবর্তনশীল প্রত্যয় যার সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই।

৩) কোন আদর্শ বা মানদণ্ডের, যথা - নৈতিক মাণদণ্ডের, উল্লেখ করেও সামাজিক প্রগতিকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কারণ ঐ নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বজনগ্রাহ্য না হতেও পারে। আদিম মানুষের কাছে যে কাজ নৈতিক দিক থেকে ভালোরূপে বিবেচিত হয়েছে তা যে সামাজিক প্রগতির পরিচায়ক হবে, এমন কিন্তু নয়। পার্শ্ববর্তী কোন উপজাতির কাছে বা কোন সভ্য জাতির কাছে ঐ একই কাজ নীতিগর্হিতরূপেও বিবেচিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন, বোর্ণিয়ার কোন উপজাতি যদি 'শিকারে সাফল্য'কে প্রগতিরূপে গণ্য করে তাহলে সেটা হবে কেবলমাত্র তাদেরই বিচার অনুসারে, পার্শ্ববর্তী অন্য কোন উপজাতি অথবা পরবর্তীকালে কোন সভ্য জাতির কাছে শিকারে সাফল্য সামাজিক প্রগতিরূপে বিবেচিত নাও হতে পারে।

৪) বিশেষ কোন বিশেষণ যথা - ‘অর্থনৈতিক’, ‘চিকিৎসা’ ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে এবং সেসকল ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মূল্যায়ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে, ‘প্রগতি’ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা গেলেও, বিশেষণ বর্জিতভাবে সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয় না। বিশেষণবর্জিত সামাজিক যে কোন পরিবর্তনকে দুইভাগে বিচার করা যা, ইতিবাচকভাবে অথবা নেতিবাচকভাবে অথবা তার উৎকর্ষের দিকটি আলোকপাত করে, অথবা তার অপকর্ষের দিকটি আলোকপাত করে। এর ফলে একই সামাজিক পরিবর্তনকে অনেকে যেমন ‘উন্নয়ন’ বলেন, আবার অনেকে ‘অনুন্নয়ন’ বলেন।

‘বনাঞ্চল বিনষ্ট করে সেখানে নগর পত্তন করলে একদিকে যেমন মানুষের বসবাসের এবং কর্মসংস্থানের সুবিধা হয়, অন্যদিকে তেমনি আবার সেখানকার জলবায়ু দূষিত হয় এবং মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও ব্যাহত হয়’। ইতিবাচক দিকটির জন্য অনেকে এই প্রকার নগর পত্তনকে ‘উন্নয়ন’ বলেন, আবার অনেকে নেতিবাচক দিকটির জন্য একে ‘অনুন্নয়ন’ বলেন। স্পষ্টতই সামাজিক পরিবর্তনের মূল্যায়নের কোন বিষয়গত এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই, ভাল-মন্দের বিচারটি ব্যক্তির মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। কাজেই সামাজিক কোন পরিবর্তনকে ‘পরিবর্তন’রূপে গণ্য করা গেলেও তাকে :প্রগতি’রূপে নির্দ্বিধায় গণ্য করা যায় না। তাহলে এমন কথা বলতে হয় যে, সমাজের পরিবর্তন ও প্রগতি দুটি ভিন্ন বিষয় নয়, তারা অভিন্ন - সামাজিক পরিবর্তন যা, সামাজিক প্রগতিও আসলে তাই।

৫) মানুষের কামনা-বাসনার (desire) উল্লেখ করেও, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কোন সামাজিক পরিবর্তনকে 'উন্নয়নমূলক' বলা যাবে না। অর্থাৎ এমন বলা যাবে না যে, অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় যখন তাদের কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে নগর পত্তন এবং কলকারখানার পত্তন করেছে তখন সেই পরিবর্তনকে অর্থাৎ নগরায়নকে অবশ্যই 'প্রগতি'রূপে গণ্য করতে হবে। ম্যাকাইভার এমন অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন, ঐ ইচ্ছা কতক মানুষের ইচ্ছা, সকল মানুষের নয় এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ যখন কোন কিছু ইষ্টজ্ঞানে কামনা করে তখন কেবলমাত্র কাছের পরিণাম উপলব্ধি করতে পারে, দূরবর্তী পরিণামকে নয়। কলকারখানা এবং নগর পত্তন করলে মানুষের শ্রম যে পূর্বাপেক্ষা লাঘব হয়, জীবন-যাপন অনেক স্বচ্ছন্দ হবে, এই প্রকারে নিকটবর্তী পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হলেও দূরবর্তী পরিণাম সম্পর্কে, প্রাণঘাতী দূষণ সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে মানুষ অবহিত হতে পারে না।

বাস্তবিকপক্ষে, ম্যাকাইভার বলেন, দূরদৃষ্টির অভাবে মানুষ কাম্য বিষয় (desired object) এবং কামনাযোগ্য বিষয় (desirable object)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। আর তার ফলে কাম্য বিষয় লাভের জন্যই সামাজিক পরিবর্তকে কামনা করে। কাম্য বিষয়ের মূল্যায়ন বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) এবং সেজন্য কাম্য বিষয়ের উল্লেখ করে (নগর পত্তনের উল্লেখ করে) সামাজিক প্রগতির ব্যাখ্যা দেওয়া সঙ্গত হতে পারে না। কামনাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করেই ভাল-মন্দের বিচার সম্ভব। দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য কামনাযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করতে না পারায়, কোন সামাজিক পরিবর্তনকে ‘প্রগতি’রূপে গণ্য করা চলে না।

৬) বিষয়টিকে ম্যাকাইভার অন্য একভাবেও আলোচনা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে 'মানুষ মূলত একই রকমের। মানুষের দৈহিক গঠন একই রকম, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা একই রকম, কম অথবা বেশী হলেও তাদের একই রকমের কর্মপ্রবণতা ও সামর্থ্য'। এই হেতু বাক্যের ওপর নির্ভর করে এমন অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা সাধারণভাবে সকল মানুষের কাছে ভাল বা তৃপ্তিদায়ক। সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়ে যদি এইসব সাধারণ ভালোকে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সেই পরিবর্তন যে 'প্রগতিসূচক' হবে, এমন বলা যায়।

ম্যাকাইভার এমন কতকগুলি ‘সাধারণ ভাল’র উল্লেখ করেছেন, যথা - স্বাস্থ্য, দীর্ঘ সুস্থজীবন, জীবনধারণের এবং সম্পদের নিরাপত্তা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধন, প্রতিবেশীকে সম্মান প্রদর্শন, কিছু পরিমাণ শক্তি, খ্যাতি ও কর্তৃত্ব অর্জন ইত্যাদি। সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এই সব বিষয়কে অধিকাধিক লাভ করতে পারে তাহলে সেই পরিবর্তনকে কি ‘প্রগতি’ বলা যাবে না ?

এই প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার মুষ্টিমেয় ‘সাধারণ ভালো’কে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। তাদের মধ্যে একটি দৈহিক বা আঙ্গিক ভালো (organic well-being) এবং অপরটি সামাজিক ভালো (social good)। স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদি হল ‘দৈহিক ভালো’; আর প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন, খ্যাতি ও কর্তৃত্ব অর্জন ইত্যাদি হল ‘সামাজিক ভালো’। প্রথম প্রকার ভালোর কামনার ক্ষেত্রে সভ্য মানুষের সঙ্গে অসভ্য ও বর্বর মানুষের, এমনকি পশুদেরও কোন প্রভেদ নেই - জীব তার জৈব তাগিদে এসবের কামনা করে। কাজেই সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে এসকল বিষয়কে লাভ করা গেলেও সেই পরিবর্তনকে ‘প্রগতি’সূচক বলা সঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ভালো অর্থাৎ 'সামাজিক ভালো' অপেক্ষাকৃত এক জটিল বিষয়। যাদের সামাজিক ভালো'রূপে গণ্য করা হয় - যথা সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধন, মান, যশ, খ্যাতি, কর্তৃত্ব অর্জন ইত্যাদি স্বত্যঃমূল্যবান নয়, তারা প্রত্যেকে পরতঃমূল্যবান; অর্থাৎ এসবকে মানুষ তাদের লাভ করার জন্য কামনা করে না, কামনা করে উচ্চতর কোন লক্ষ্য লাভের উপায়(means) হিসাবে। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন, 'সভ্যতা প্রসারণের কোন এক সময়ে মানুষ সভ্যতাকে কৃষ্টি বা সংস্কৃতিরূপে (যা লক্ষ্য) গণ্য করে এবং তখন সে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের (end) পরিবর্তে লক্ষ্য লাভের উপায়কেই (অর্থাৎ সভ্যতাকে) লক্ষ্যরূপে গণ্য করে। বিজ্ঞানমনস্ক ম্যাকাইভার ও পেজ আভিজ্ঞাতিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক পরিবর্তনের পর্যলোচনা করে বলেন, উৎপত্তিকাল থেকে অদ্যাবধি সমাজ যে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা গেলেও পরিবর্তন অতিরিক্তভাবে সমাজের 'প্রগতি'কে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায় না।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। সকল রকম সামাজিক প্রগতির মাধ্যমে কোন-না-কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তন প্রতিপন্ন হয়। এবং সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সমগ্র সমাজব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। আবার এই প্রতিক্রিয়া কোথাও যেমন ইতিবাচক (positive) হতে পারে, আবার কোথাও তেমনি তা নেতিবাচক (negetive) হতে পারে। বলা হয় যে, সামাজিক পরিবর্তনের এই ইতিবাচক দিকটির মাধ্যমে সামাজিক প্রগতি সূচিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এ কথাও এসে পড়ে যে সামাজিক পরিবর্তনের নেতিবাচক দিকটি প্রগতি বিরোধী। আর এই কারণে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সামাজিক প্রগতি সম্পর্কিত আলোচনার ব্যাপারে অনীহা দেখা দেয়।

তবে সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে উক্তরূপ নানা প্রকার বিরূপ আলোচনার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজতত্ত্বের আধুনিক আলোচনায় সামাজিক প্রগতি হল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মার্কস্‌বাদী সমাজবিজ্ঞানীগণ শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থাকে আদর্শ লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এই লক্ষ্যে তাঁরা সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতি সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় আস্থাশীল। সর্বোপরি তত্ত্বগতভাবে স্বীকার না করলেও সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে মূল্য বিচার (value judgement) সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা বাস্তবে সম্ভব নয়।

সমাজতত্ত্বের অর্ন্তগত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার প্রাক্কালে মূল্যমানের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আবার সময় ও সমাজভেদে প্রগতি প্রসঙ্গে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনপন্থীরা সর্বদাই সনাতন বা সাবেককালের সবকিছুকেই অধিকতর অভিপ্রেত বলে মনে করেন। বিপরীতক্রমে আধুনিকপন্থীরা বর্তমানের জয়গানে মুখর এবং উৎকৃষ্টততর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে বিশেষভাবে আশাবাদী। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রতীয়মান হয় এটি অস্বীকার কোন উপায় নেই।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ

কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলসের মতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। সামাজিক পরিবর্তন বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনের মত কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলে। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদকে সাধারণভাবে বলা হয় ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসীয় দর্শন হল বস্তুবাদী দর্শন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেরই অংশ। মানব সমাজ ও তার ইতিহাসের প্রকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রয়োগকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলা হয়। ওয়েপার (Wayper) এই প্রসঙ্গে বলেন, 'Historical materialism is the application of the principles of dialectical materialism to the development of society'।

সমাজের পরিবর্তনের চরিত্র ও সেই পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রধানত দুটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এদের একটি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical materialism) এবং অপরটি হল উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব (Theory of surplus value)।

১) ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ঃ মার্কসীয় দর্শন 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism) নামে খ্যাত। মার্কস তাঁর পূর্ববর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) 'দ্বান্দ্বিক ভাববাদ'-এর অনুকরণে তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা করলেও তিনি হেগেলের কেবল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ভাববাদ গ্রহণ না করে বস্তুবাদের আলোকে তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের মতবাদ অনুসারে ভাব বা চিন্তাই পরমার্থসৎ, যার অভিব্যক্তি ঘটে দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে - বাদ (thesis), বিবাদ বা প্রতিবাদ (anti-thesis) ও বিসম্বাদ বা সম্বাদের(synthesis) মধ্য দিয়ে। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় চলে ভাব বা চিন্তার অন্তহীন অভিব্যক্তি এবং এই অন্তহীন পদ্ধতিতেই ঘটে সমাজের উত্থান ও পতন বা সামাজিক পরিবর্তন। হেগেলের মতে, সমাজস্থ মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, তার ধর্মনীতি, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুতেই মানুষের ভাব বা চিন্তার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং ঐ ভাব বা চিন্তাই সমাজের পরিবর্তনকে ইতিহাসের গতিকে বিশেষ খাতে প্রবাহিত করে।

মার্কস ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস ইতিহাসের এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকে বাতিল করে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্কসের মতে, মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে সেটাই হল তার বস্তুময় সত্তা, আর ঐ বস্তুগত পরিবেশেই তার সমগ্র জীবনকে, তার ধ্যান-ধারণাকে, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বস্তুগত সত্তাই মানুষের ভাব বা চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের ভাব বা চেতনা ঐ বস্তুগত সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে না - মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটাই হল মূলকথা। বস্তুগত পরিবেশ বলতে মার্কস মূলত সমাজের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন। মানুষের মৌল চাহিদার(খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের) পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়, মার্কস যাকে ‘অর্থনৈতিক ব্যবস্থা’ বলেছেন, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের সামাজিক চেতনাকে নির্ধারিত করে এবং সমাজ পরিবর্তনের কারণ হয়। মার্কসের এপ্রকার অভিমতের জন্য সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বকে বলা হয় ‘অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ’(Economic Determinism)।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে সমাজের প্রতিটি পর্যায় এক 'বস্তুগত' পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে, - উৎপাদন কার্যে যুক্ত মূলত দুটি শ্রেণীর মানুষ যথা শ্রমিক শ্রেণি ও মালিক শ্রেণী - এক বিশেষ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি কখনো স্থির থাকতে পারে না। তার গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন লঙ্গল থেকে ট্রাক্টর, ট্রাক্টর থেকে উন্নত ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি থেকে বাষ্পচালিত বৃহদাকার যন্ত্রপাতি ও কারখানা ইত্যাদি। এজাতীয় পরিবর্তনের ফলে সমাজের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয়, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্যরূপে দেখা দেয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার অর্ন্তগত এই মৌলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেই মার্কস ‘শ্রেণীদ্বন্দ্ব’ (class strugle) নামে অভিহিত করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের Manifesto of the Communist গ্রন্থের প্রথম ও মূল কথাটি হল ‘এযাবৎ সমস্ত মানসমাজের ইতিহাস এক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইতিহাস’। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বই মার্কসের মতে, সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলেই প্রত্যেক পর্যায়ের সমাজ এক উন্নতর ভিন্ন সমাজে পরিণত হয়েছে - দাস সমাজ সামন্ত সমাজে, সামন্ত সমাজ পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজের (sociolism) প্রতিষ্ঠা হবে।

মার্কস মনে করেন, এযাবৎ সমাজের প্রতিটি স্তরে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকলেও প্রতিকূল পরিবেশ থাকার জন্য শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হতে পারে নি। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণী সর্বাত্মক বিপ্লবের পথ ধরে শ্রেণীহীন সমাজের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাটি পূর্ববর্তী স্তরগুলি অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির - পঁজিপতিদের শোষণ যেমন চরম মাত্রায় পৌঁছেচে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমের প্রভূত উন্নতির ফলে তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী সুসংবদ্ধ হবার সুযোগ লাভ করেছে। কাজেই কার্ল মার্কসের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের সর্বাত্মক বিপ্লবের ফলে, অনতিকাল পরে কোন একদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান হবে, উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বহারাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং এক শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

২) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) ঃ

উৎপাদন ব্যবস্থায় কিভাবে বিত্তবান মালিকরা বিত্তহীন শ্রমিকদের বঞ্চিত করে, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে মার্কস সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ধরাযাক্ চুক্তি মতো শ্রমিককে ৮ ঘন্টা শ্রম দেবার পরিবর্তে মালিক তাকে ৯/১০/১১/১২ ঘন্টা শ্রম দিতে বাধ্য করে। এই অতিরিক্ত শ্রমের উৎপাদিত শ্রমের মূল্য শ্রমিকরা পায় না (তারা কেবল চুক্তি মতো ৮ ঘন্টা শ্রমের মূল্য পায়), তার সবটাই 'উদ্বৃত্ত মূল্য'রূপে (surplus value) বা লাভের অঙ্করূপে মালিকরা আত্মসাৎ করে । আর এ প্রকার উদ্বৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ করার জন্য মালিকের পুঁজি যতই স্ফীত হতে থাকে, শ্রমিক শ্রেণী ততই নিঃস্ব হতে থাকে। মালিক শ্রেণীর এ প্রকার বঞ্চনার জন্যই শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র হতে থাকে এবং ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সমাজের পরিবর্তন ঘটে।

মার্কসের সার কথা হল, শ্রেণী-দ্বন্দ্বই সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণ। আদিম শ্রেণীহীন সমাজে মানুষের অভাবের তুলনায় প্রকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় এক ও অভিন্ন গোষ্ঠী জীবন প্রচলিত ছিল এবং 'শ্রেণীভেদ' বলে কিছুই ছিল না। সমাজের এই অবস্থাকেই মার্কস 'আদিম সাম্যবাদ'(primitive communaslism) বলেছেন। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পদের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায়। এমন অবস্থায় সম্পদের মালিকানার জন্য মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরাজিতরা বিজিতের দাসে পরিণত হয়। আর এভাবেই প্রথম শ্রেণীভিত্তিক দাস-সমাজের প্রবর্তন হয়। দাস সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণী হল সম্পদের মালিক 'অভিজাত' এবং মানবাধিকার বঞ্চিত 'দাস'। কৃষিভিত্তিক দাসসমাজ আবার পরিবর্তিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়। এখানেও আগের মতোই প্রধানত দুটি শ্রেণী বর্তমান ছিল - ভূমধ্যকারী জমিদার ও ভূমিহীন কৃষক।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় - মানুষ এক পণ্য উৎপাদন থেকে ভিন্ন পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়েছে এবং সেইমতো উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মানুষ ক্রমশঃই কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হতে থাকে এবং তার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য মানুষ উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে, কলকারখানা নির্মাণ করে ও শিল্প নগরীর পত্তন করে। এভাবেই কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পরিবর্তিত হয়ে শিল্প-ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়।, যেখানে দুটি শ্রেণী হল - মালিক ও শ্রমিক। মার্কস বিশ্বাস পোষণ করেন যে, বিপরীত মেরুর এই দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই একদিন শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রের (socialism) প্রতিষ্ঠা হবে।

তবে এপ্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে মার্কস কিন্তু সমাজতন্ত্রকে সামাজিক পরিবর্তনের চরম লক্ষ্য বলেন নি। সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্য হল সাম্যবাদ (Communism)। সমাজতন্ত্র ঐ লক্ষ্য পথের একটি স্তর বা ধাপ মাত্র। সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদ করে শ্রমজীবীরা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তা পুরোপুরি সম্ভব হয় না, কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসক দলের প্রয়োজন হয় এবং ফলত শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য থাকে। কাজেই এই অবস্থাতেও সমাজে জনগণের দাবী সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। মার্কসের মতে, রাষ্ট্রই হল শোষণ যন্ত্র এবং সেজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রচলন থাকলে শোষণের অবসান হতে পারে না।

তবে, মার্কস আশা করেন যে, এমন এক সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে বসবাস করে মানুষের অন্তর ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হবে এবং পরিশেষে মানব সমাজে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হবে যখন শোষণ যন্ত্ররূপে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। ভাবী সমাজের এমন অবস্থাকেই মার্কস 'সাম্যবাদী অবস্থা' (Communism) বলেছেন। সাম্যবাদী সমাজে মানুষ তার বস্তুগত পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে তার কলুষমুক্ত অন্তরের দ্বারা, মানবিক বোধের দ্বারা, প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা পরিচালিত হবে। এমন এক আদর্শ সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে তার সাধ্য ও সামর্থ্য মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

সমালোচনা ঃ

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কসীয় ব্যাখ্যার সমালোচক হিসাবে অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এবং অধ্যাপক কিংস্‌লে ডেভিস(Kingsley Davis) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কীয় মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তির সাহায্যে তা করা হয়েছে তা আমরা এখন আলোচনা করতে পারি।

১) মার্কসবাদে কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণের কথা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশভেদে বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে এবং হয়ও। এতদ্‌সত্ত্বেও চিন্ত-চেতনা, মূল্যবোধ, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমজাতীয় হতে পারে এবং হয়ও। প্রকত প্রস্তাবে সাম্প্রতিককালে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। তার সর্বব্যাপক প্রভাবের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমানে মানব সমাজের মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, আচার-বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এক অভিন্নতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিন্নতা অস্বাভাবিক নয়, নিতান্তই স্বাভাবিক।

অনুরূপভাবে আবার বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত দেশের উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনের উপায়-পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার কল্যাণে অল্পবিস্তর অভিন্ন রকমের। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সকল দেশের সামাজিক সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্ক অভিন্ন প্রকৃতির নয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের কথা বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে এই রাষ্ট্র দুটি বিশেষভাবে সম্পদশালী ও শক্তিধর। এই দুই রাষ্ট্রের উৎপাদন-উপাদানসমূহ এবং উৎপাদন পদ্ধতি মোটামুটি সমজাতীয়। কিন্তু রাষ্ট্র দুটির সামাজিক কাঠামো এবং উৎপাদন-সম্পর্ক স্পষ্টতঃই পৃথক প্রকৃতির।

২) মার্কস ও এঙ্গেলস সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু কীভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটলো তা তাঁরা তেমনভাবে পর্যালোচনা করেন নি।

৩) বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের মতে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণা হল আসলে একটি উদ্দেশ্যগত হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যটি হল ধনতন্ত্রের বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের অনিবার্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কীত মার্কসীয় মতবাদটি গড়ে তোলা হয়েছে। আর তার জন্য আলোচ্য মতবাদটি একদেশদর্শিতাদোষ দুষ্ট হয়ে পড়েছে।

৪) মার্কসবাদে দ্বান্দ্বিক নীতির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসানের পর মার্কসের দ্বান্দ্বিক নীতি অকার্যকর হয়ে পড়বে। স্বভাবতঃই সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই নীতি অর্থহীন প্রতিপন্ন হবে। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন বা সমাজ-বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হল সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের পর। তখন শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-দ্বন্দ্ব থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে তখন দ্বান্দ্বিক নীতি অকার্যকর হয়ে পড়বে। আর এরকম পরিস্থিতিতে মানবসমাজ কী চিরকালের জন্য এক অচল-অনড় স্থায়ী রূপ ধারণ করবে। মানব সামাজ কী একটি গতিহীন অচলায়তনে পরিণত হবে ? এ জাতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর নাই মার্কসবাদে।

৫) মার্কস যে অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থাকে সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি বলেছেন, তা সর্বংশে গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা যেমন কখনো কখনো মানুষের বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি আবার কখনো কখনো মানুষের ধ্যান-ধারণা, তার বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অর্থাৎ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

৬) সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে মার্কসের ইতিহাস-ভিত্তিক ব্যাখ্যাকে অনেকে (যেমন কার্ল পপার) 'ইতিহাসবাদদুষ্ট'(historicism) বলে অভিযুক্ত করছেন। ইতিহাসের প্রতি ব্যক্তি-চেতনা আরোপ করলে এমন দোষ ঘটে। মার্কসের মতে, সমাজের ইতিহাস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কোন লক্ষ্য লাভের জন্য অগ্রসর হয়ে চলেছে। এমন বললে ইতিহাসকে লক্ষ্যভিমুখী বলতে হয়। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কেবল চেতনা সত্তারই থাকতে পারে। কাজেই অভিযোগ হল - ইতিহাসকে লক্ষ্যভিমুখীরূপে গ্রহণ করার জন্য মার্কসের মতবাদ 'ইতিহাসবাদেরদোষে দুষ্ট' হয়েছে।

৭) ‘বিপ্লবাত্মক অভিযানের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী একদিন ধণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে’ - মার্কসের এই ভবিষ্যৎবাণী আজও বাস্তবে সম্ভব হয় নি। সাম্প্রতিককালের বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটাই লক্ষ্য করা যায়, যে সকল দেশ একদা শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল সেইসব দেশ থেকে আজ সমাজতন্ত্র উচ্ছেদ হতে চলেছে। পক্ষান্তরে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণী বৈষম্যকে স্বীকার করে ক্রমশঃই উন্নত হয়ে চলেছে। শিল্পন্নোত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী নানাপ্রকার শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের জীবন ধারণের মানের প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও বিপ্লবের পথ ধরে ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে উচ্ছেদ করে নি। শ্রমিকদের আহার্য বাসস্থান, জীবন ধারণের মান ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত উন্নতির ফলে বর্তমানে শিল্পন্নোত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্ক সহযোগিতার সম্পর্ক, বোরোধিতার নয়।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত
(Gandhi’s explanation of social change)

গান্ধীজীর মতে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য হল ‘সর্বোদয়’। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ‘সর্বোদয়’ হল ‘সর্ব + উদয়’ যার অর্থ ‘সবার বিকাশ সাধন’, ‘সবার হিত বা কল্যাণ সাধন’, ‘সাবার সেবায় সবাইকে নিয়োজিত করণ’। গান্ধীজী এক্ষেত্রে অবশ্য পাশ্চাত্য হিতবাদী নীতিবিদ বেন্থাম ও মিলের সামাজিক আদর্শকে অনুকরণ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। বেন্থাম ও মিলের এই প্রসঙ্গে আদর্শ হল, ‘সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ’ (greatest happiness of the greatest number)। এটিই প্রত্যেক সমাজের এবং সমাজস্থ সকল ব্যক্তির পরমকাম্য।

এই অভিমত অনুসারে যদি কোন কর্ম ও কর্মনীতির দ্বারা সমাজের ‘সর্বধিক লোকের সর্বাধিক হিত’ সাধনে অল্প সংখ্যক লোকের অহিত হয়, তাহলেও সেই কর্ম বা কর্মনীতিকে ‘সমাজ কল্যাণ সাধক আদর্শ কর্ম বা কর্মনীতি’রূপে গণ্য করতে হবে। পুঁজিবাদ(capitalism), গণতন্ত্রবাদ (mdemocracy), এমনকি সমাজতন্ত্রনাদে(socialism)ও ‘সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত’কে সমাজের আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গান্ধীজী হিতবাদী এই আদর্শকে সঠিক বলে মনে করেন নি। ‘সর্বোদয় আদর্শ’, গান্ধীজীর মতে, ‘সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত সাধন’ নয়, তা হল, ‘সকল মানুষের সকল রকম হিত সাধন এবং সমান হিত সাধন’।

গান্ধীজি সম্মত রামরাজ্য বা স্বরাজ ঃ

সর্বোদয় সমাজই গান্ধীজির ধ্যানের ভারত, রামরাজ্য, স্বরাজ যেখানে রাজা(শাসক) হবেন প্রজাপালক, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ এবং প্রজার সম্মিলিত ইচ্ছাই হবে রাজার ইচ্ছা। গান্ধীজি প্রদত্ত সর্বোদয় সমাজ বা রামরাজ্যের সার কথা হল, সমগ্র জগৎ একই আত্মার বহিঃপ্রকাশ, মানুষে মানুষে প্রকৃত কোন প্রভেদ নেই। সমাজে প্রচলিত যে বৈষম্য ব্যবস্থা, গান্ধীজির মতে তা সর্বোদয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত। রামরাজত্বে এমন ব্যবস্থা থাকবে যেখানে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকে বঞ্চিত হবে না।

সকল মানুষেরই অর্থাৎ শক্তিমান, বুদ্ধিমান, ধনবান দুর্বল, নির্বোধ, দরিদ্র প্রভৃতি নির্বিশেষে সবারই ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক চাহিদা আছে। কাজেই গান্ধীজির ধ্যানের ভারতকে এমন হতে হবে যেখানে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ইতর-ভদ্র, ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল, জ্ঞানী-অজ্ঞানী নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম-দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকের আত্মবিকাশে সমান সুযোগ দিতে হবে। 'রামরাজ্য' বা 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠাই হবে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য।

সর্বোদয় সমাজে শ্রমের মর্যাদা ঃ

সমাজসেবার জন্য বিভিন্ন পেশা বা কাজ যেমন মেথরের, মুচির, ধোপার, নাপিতের, কামারের, কুমোরের, কৃষকের, উকিলের, ডাক্তারের, শিক্ষকের, প্রযুক্তিদবিদের কাজ সমান মূল্যবান ও সমমর্যাদা সম্পন্ন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মেথর, মুচি, কৃষকের বৃত্তি বা পেশাকে হেয় জ্ঞান করা হয়। অপরপক্ষে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষকের বৃত্তিকে উচ্চজ্ঞানে গ্রহণ করা হয় এবং এইভাবে তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়। এপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সমাজের সাম্যনীতি ও ন্যায়নীতিকে লঙ্ঘন করে। সমাজের সকল কাজের পারিশ্রমিকের মধ্যে যদি তেমন কোন ব্যবধান না থাকে এবং সকল রকম বৃত্তিকে যদি সমান মর্যাদা সম্পন্নরূপে গণ্য করা হয়, তাহলে সেবামূলক বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষের মনে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দানা বাধবে না। তারা নিজ নিজ কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে অপরের বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না। এতে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সহজ সমাধান হবে তেমনি অপরদিকে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে।

গান্ধীজির মতে সমাজ-সংস্কারের বা পরিবর্তনের প্রথম ধাপই হল সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতাকে সমূলে উৎপাটিত করা। দীর্ঘদিন ধরে এই অস্পৃশ্যতারূপ অন্ধ-কুসংস্কার ভারতীয় সামাজিক পরিবেশকে দূষিত ও কলুষিত করে রেখেছে। মূল শুদ্রশক্তিকে অবহেলা করে সমাজকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। তাই ভারতীয় সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে প্রথমেই আমাদের এই জাত-পাতের বিভেদকে নিঃশেষে বিনাশ করতে হবে। কারণ এই অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল করে রেখেছে। যা সমাজকে সম্বদ্ধ করে গান্ধীজির মতে তাই 'ধর্ম' আর সমাজকে খণ্ডিত করে গান্ধীজির মতে তাই 'অধর্ম'। গান্ধীজি তাঁর ধ্যানের ভারতকে ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাজ পরিবর্তন অর্থাৎ আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য গান্ধীজির মতে আমাদের অবশ্য করণীয় বা পালণীয় বিষয়গুলি হল ঃ

১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ২) জাত-পাত বৈষম্য উচ্ছেদ, ৩) মদ্যপান নিষেধ, ৪) গ্রামোন্নয়ন, ৫) অর্থনৈতিক সাম্য, ৬) নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, ৭) প্রাথমিক শিক্ষা, ৮) কৃষি-উন্নয়ন, ৯) কুটির-শিল্প উন্নয়ন, ১০) স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও পরিসেবা, ১১) কুষ্ঠরোগীর সেবা, ১২) আদিবাসীদের উন্নয়ন ও ১৩) দাতব্য ইত্যাদি।

অহিংসা ঃ

সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সমাজকল্যাণ সাধনকেই গান্ধীজি মানুষের জীবনের পরমার্থরূপে গণ্য করে বলেছেন যে, ঐ অভীষ্ট লাভ অর্থাৎ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কেবল অহিংসা পথেই হবে, কোন হিংসার পথ ধরে নয়। সমাজ কল্যাণ সাধনের প্রতিটি উপায়কে হতে হবে অহিংস। হিংসার পথ ধরে সৎকর্ম সাধন সম্ভব নয়। যারা বলেন, 'সৎ উদ্দেশ্য অসৎ উপায়কে পরিশুদ্ধ করে', গান্ধীজি তাদের এই মতকে সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, 'অসৎ উপায় মহৎ উদ্দেশ্যর সদ্‌গুণকে বিনষ্ট করে'। অহিংসারূপ সৎপথে যদি সমাজ পরিবর্তন তথা সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যদি রক্তক্ষয়ী হিংসার পথে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই কল্যাণ অকল্যাণের নামান্তর হবে, কারণ হিংসায় হিংসা বাড়ে, কল্যাণ হয় না।

সত্যাগ্রহ ঃ

গান্ধীজি সম্মত অহিংসার পথ অবলম্বন করে সমাজ পরিবর্তনের পথ সুকর নয়, তা অতিব দুষ্কর। এ হল ন্যায় বা সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহের পথ। গান্ধীজির মতে, 'সর্বোদয়' বা 'স্বরাজ' সমাজের আদর্শ। আর এই আদর্শ লাভের উপায় হল অহিংসা-মন্ত্র-সত্যাগ্রহ। অহিংসা-মন্ত্র সত্যাগ্রহীর কল্যাণ বিধায়ক নৈতিক মন্ত্র। এই মন্ত্র অস্ত্রহীন বীরের মন্ত্র। গান্ধীজির মতে, 'সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য'। একনিষ্ঠ সত্যের প্রতি যে আগ্রহী সেই সত্যাগ্রহী। আর অহিংস পথে সত্যনিষ্ঠভাবে চলাটাই 'সত্যাগ্রহ'। সত্যাগ্রহীর মন্ত্র হবে অহিংসা, প্রেম ও সেবা। এই পথ তাই কাপুরুষ বা চরিত্রহীনের পথ নয়, এ পথ হল নির্ভীক ও চরিত্রবানের নিরস্ত্রপথ। নির্ভীক ও চরিত্রবলে বলীয়ানই কেবল পারে তার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাকে হাতিয়ার করে সশস্ত্র কাপুরুষের সম্মুখীন হতে এবং প্রয়োজন হলে সমাজ কল্যাণে অকুতোভয়ে ও অবিচলিত চিত্তে আত্মবিসর্জন করতে।

সত্যের পথে অহিংসাকে অস্ত্র করে স্বরাজ বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজি নিম্নোক্তভাবে সমাজ পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় বলেছেন।

অছিতন্ত্র (Trusteesheep)বা ভূদান-ব্যবস্থা ঃ

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য গান্ধীজি তাঁর প্রস্তাবিত সমাজ-পরিবর্তন-ব্যবস্থায় জমিদার ও পুঁজিপতিদের অছি বা ট্রাষ্টীর ভূমিকা পালন করতে বলেছেন। গান্ধীজি পৌরাণিক বেদ ও উপনিষদের ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণ করে তাঁর প্রবর্তিত অছিতন্ত্রে ত্যাগকেই ভোগের পথ ও পাথেয় বলেছেন। ভারতীয় ঋষির প্রদত্ত মহাবাক্য 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিতা' অর্থাৎ 'তোমার ভোগ হোক ত্যাগের মাধ্যমে' - গান্ধীজির অছিতন্ত্রের মূলমন্ত্র। অছিতন্ত্রে এটিই বলা হয় যে, কোন মানুষই কোন সম্পত্তির আসল মালিক নয়।

জগতের সব কিছু - স্থাবর-অস্থাবর, চেতন-অচেতন, সূক্ষ্ম-স্থূল, দৃষ্ট-অদৃষ্ট প্রভৃতির আসল মালিক ভগবান। মানুষ কেবল ঐ সকল সম্পত্তির অছি বা ট্রাষ্টী মাত্র। প্রজার মালিক রাজা নয়, জমির মালিক জমিদার নয়, কলকারখানার মালিক শিল্পপতি নয়, - এমনকি মানুষের বল-বীর্যের, মেধা-জ্ঞানের মালিকও মানুষ নয়, তা হল সত্যরূপ ভগবান। গান্ধীজির অছিতন্ত্রের সারকথা হল - প্রত্যেক মানুষ, রাজা-প্রজা, ভূমধ্যকারী-ভূমিহীন, শিল্পপতি-শ্রমিক নির্বিশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পত্তিকে ভগবানের সম্পত্তিরূপে গণ্য করে সেই সম্পত্তির যৎসামান্য নিজের ভোগের জন্য ব্যায় করবেন এবং বাকি সব অংশ অপরের ভোগের জন্য ত্যাগ করবেন।

সীমিত রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ও বিশুদ্ধ গণতন্ত্র ঃ

সমাজের সংগঠনরূপে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও গান্ধীজির মতে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অর্থাৎ রামরাজ্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে সীমিত ও যথাসম্ভব সঙ্কুচিত। রাজনৈতিক দিক থেকে সার্বভৌম কর্তৃত্ব অর্পিত হবে জনগণের ওপর, রাষ্ট্রের ওপর নয়। আদর্শ রাষ্ট্রকে হতে হবে নীতি ও ধর্মভিত্তিক। অবশ্য এই ধর্ম হিন্দু বা খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মের মতো বিশেষ কোন ধর্ম নয়, ধর্ম হল জনকল্যাণসাধক ধর্ম। রাষ্ট্র যদি তার ধর্ম থেকে অর্থাৎ জনকল্যাণসাধক কর্ম থেকে বিরত থাকে তাহলে অহিংস পথে জনগণের রাষ্ট্র-বিরোধিতার অধিকার স্বীকৃত হবে।

গান্ধীজি রাষ্ট্রের আইনসভাকে বিদ্রুপ করে বলেছেন, ‘বন্ধ্যা স্ত্রীলোক’। বন্ধ্যা স্ত্রীলোক যেমন সন্তান প্রসব করে না রাষ্ট্রের আইনসভাও তেমনি জনকল্যাণসাধক কোন আইন প্রণয়ন করে না, কেবল শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থসাধক আইন প্রণয়ন করে। আর এ কারণেই স্বরাজ বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব খর্ব হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজির মতে, রাষ্ট্রের প্রকৃত কাজ জনগণকে বঞ্চিত করা নয়, হিংসাত্মক দমন-পীড়ন নয়। রাষ্ট্রের আসল কাজ হল, এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার আত্মশক্তিতে বিকশিত হবার সুযোগ পায় এবং সেভাবে সমাজকেও উন্নত করতে পারে।

তবে রাজনৈতিক আদর্শরূপে গান্ধীজি গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি স্বার্থান্বেষী কপট ব্যক্তির পরিচালন-ব্যবস্থাকে একেবারেই সমর্থন করেন নি। আদর্শ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হতে হবে বিশুদ্ধ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সেই সকল ব্যক্তিরা যুক্ত থাকবেন যাদের চরিত্র নিষ্কলুষ, যারা নির্লোভ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পক্ষপাতশূন্য। এমন শাসকবর্গ নির্বাচিত না হলে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। গান্ধীজি 'রাজনীতি' শব্দটি ব্যবহারের পরিবর্তে 'লোকনীতি' শব্দটি প্রয়োগ করে বলেছেন, আদর্শ সমাজের শাসন-ব্যবস্থা লোকনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে, রাজনীতির দ্বারা নয়। লোকনীতিতে সকল লোকের অর্থাৎ সমগ্র সমাজের নীতি প্রতিফলিত হয়। আর রাজনীতিতে রাজা অথবা শাসক সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মাত্র কয়েকজনের স্বার্থসাধক নীতি প্রতিফলিত হয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য অর্থাৎ সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাই রাজনীতির পরিবর্তে প্রয়োজন লোকনীতি, যেখানে সমাজের শাসনভার ন্যস্ত থাকবে অহিংসাব্রতী সত্যাগ্রহী সমাজসেবকের ওপর, যেখানে কোন দল এবং দলীয় স্বার্থ থাকবে না, সমগ্র সমাজের সবার স্বার্থ চিন্তা করেই কর্ম সম্পাদন করা হবে।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ - পঞ্চায়েতরাজ ঃ

গান্ধীজির মতে গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নতি না হলে, আদর্শ সমাজ বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। গ্রাম-সমাজের স্বয়ম্ভর অবস্থাকেই গান্ধীজি 'গ্রামরাজ' বা 'পঞ্চায়েত রাজ' বলেছেন। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ।

বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসারে ভারতের প্রতিটি অঞ্চলকে, প্রতিটি গ্রামকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি গ্রামকে গ্রামবাসীদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে হবে। কোন্ কোন্ পণ্য অত্যাবশ্যক তা গ্রামবাসীকে নির্ধারণ করতে হবে। গ্রাম-সমাজে উঁচু-নীচু ভেদ বা জাত-পাতের ভেদ থাকবে না। শ্রমদানে সক্ষম প্রত্যেককে গ্রামের উন্নতির জন্য শ্রম দান করতে হবে এবং জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে।

সব কাজকেই সমান মূল্যবানরূপে গণ্য করতে হবে। উচ্চ আয় ও নিম্ন আয়ের পার্থক্যকে যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে কুটির শিল্পেরও উন্নতি সাধন করতে হবে। বৃহৎ শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্পেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, যাতে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্ত চাষযোগ্য জমি থাকবে, চাষের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক গরু থাকবে। এছাড়াও থাকবে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, জলাধার, নাট্যমঞ্চ ও সমিতি-ভবন ইত্যাদি।

প্রশাসনিকভাবে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। 'গ্রামরাজে' কখনো কোন মতভেদ দেখা দিলে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তার মীমাংসা করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতের আইন-প্রণয়নের অধিকার স্বীকৃত হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি, মেয়াদান্তে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বচিত করবে। যারা নির্লোভ, সংযমী, সত্যনিষ্ঠ, গ্রাম সেবায় নিয়োজিত প্রাণ, তারাই কেবল পঞ্চায়েতের সদস্যরূপে নির্বচিত হবে।

আর এভাবে প্রত্যেক গ্রামকে হতে হবে স্বনির্ভর বা স্বয়ম্ভর - শিক্ষায়, চিকিৎসায়, শাসনে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে ও বন্টনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হবে অহিংস পথে সেবা অর্থাৎ গ্রাম-সমাজের সেবা। 'সকলের তরে সকলে আমরা / প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এটাই হবে সত্যাগ্রহীর গ্রাম-সেবকের আদর্শ।

সমালোচনা ঃ

গান্ধীজি যে রামরাজ্যের উল্লেখ করেছেন তা নিছকই এক অধরা কবি-কল্পনার অনুরূপ ব্যবস্থা, যাকে কল্পনা করা গেলেও বাস্তব রূপ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজির সর্বোদয় সমাজ এক স্বপ্ন-বিলাসীর কল্প-সমাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অহিংস পথে মানুষের চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে না পারলে সর্বোদয় সমাজ কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু দীনাত্মার অন্তর বা চিত্ত শোধন অহিংসার পথে সম্ভব নয়। মনুষ্য সমাজের হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি লক্ষ্য করে যুগে যুগে যুগপ্রবর্তক মুনিঋষিগণ মানুষের অন্তর বা চিত্ত শোধনের উল্লেখ করলেও তা কেবল পুঁথির পাতায় আবদ্ধ হয়ে আছে। তাতে দীনাত্মার অন্তরের বা চিত্তের আর পরিশুদ্ধি হয় নি।

অহিংসার আবেদন মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে, তার উচ্চতর সত্তার কাছে - গর্দভের বিবেকসম্পন্ন (Conscience of an ass) নরপশুর কাছে নয়। প্রত্যেক সমাজে বিবেকজ্ঞানহীন কিছু মানুষ থাকে, নিজেদের পশু প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য যারা নির্দ্বিধায় নরহত্যা করে, অপরের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে, স্ত্রীলোকের ওপর বলাৎকার করে, অপরের শিশু-সন্তান অপহরণ করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। এ সকল নরপশুদের চিত্ত-সংশোধন অহিংস পথে হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে হিংসার পথ ধরে দুবৃত্তকে দমন-পীড়নের প্রয়োজন হয়।

গান্ধীজির অছি-ব্যবস্থাও এক স্বপ্ন-বিলাসমাত্র। মানুষের বিষয় কামনা এমনই মজ্জাগত যে, কোন রকম আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তার বিষয় আসক্তিকে অপনয়ন করা যায় না। আসলে গান্ধীজির মহান আত্মা দীনাত্মাকেও মহান কল্পনা করে 'ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ'কে সম্ভব বলেছেন। আর এখানেই গান্ধীজির অভিমতের দোষ এবং গুণও। মানুষের অন্তরে যে দেবাসুরের লড়াই নিরন্তর ঘটে চলেছ, এ বিষয়ে গান্ধীজি সম্পূর্ণরূপে অবহিত। তবে তিনি আশাবাদী দেবাসুরের লড়াইয়ে দেবতা একদিন অসুরকে পরাজিত করবেই এবং সেদিন অন্তরশুদ্ধির ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় শ্রমদান, ভুমিদান, সম্পত্তিদান ইত্যাদিতে সম্মত হবে - এই আশা তিনি পোষণ করেন। কিন্তু মানব সমাজে গান্ধীজির এই আশাও দুরাশা।

তত্ত্বের দিক থেকে গান্ধীজির মতবাদের কোন দোষ নেই, এমন বলা গেলেও। বাস্তবে তা অকেজো। গান্ধীজির আদর্শ অনুসারে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব করতে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষের যে চারিত্রিক বল ও ঔদার্য প্রয়োজন, বাস্তবে অধিকাংশ মানুষ সেই ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত। গান্ধীজি এবং তাঁর অনুগামী মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মতো সেবাব্রতী সন্ন্যাসী সমাজে নিতান্তই দুর্লভ।

তবে এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা চলে যে, গান্ধীজির বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে অভিমত ভারতীয় সমাজে উন্নয়ন প্রসঙ্গে অতি মূল্যবান অভিমত, এটা অস্বীকার করা যায় না। গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের উন্নয়ন যে অবহেলিত গ্রামগুলির সার্বিক উন্নতি ছাড়া সম্ভব নয়, এ বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ